এফ্লুয়েঞ্জা, এক সর্বানাশা সামাজিক ব্যাধি

- অপার্থিব

এফ্লুয়েঞ্জা (Affluenza) শব্দটি প্রথম চালু হয় ১৯৯৭ সালে মার্কিন টেলিভিশনে ঐ সময়ে একই নামে প্রচারিত একটি সিরিজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। ইংরেজী শব্দ Affluence (বিত্ত) ও Influenza এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এর ব্যুৎপত্তি। পরবর্তীতে ঐ নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়, যা ঐ সিরিজের উপর ভিত্তি করে লেখা । এক কথায় এফ্লুয়েঞ্জা হল এমন একটি সামাজিক ব্যাধি, যার কারণে মানুষ এক তীব্র ভোগাসক্তি অনুভব করে, তার জীবন হয়ে উঠে ভোগসর্বশ্ব, ভোগবাদী, আর যার কারণে সে আর প্রয়োজনের তাগিদে জিনিষ কেনেনা, বরং জিনিষ কেনার তাগিদে কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করে। মেতে উঠে ঘোড়া রোগে। হয়ে ওঠে উড়নচন্ডে। জিনিষ কেনার প্রতিযোগিতায় কে কাকে টেক্কা দিতে পারে এটাতেই যেন জীবনের সার্থকতা । এই লাগামহীন ভোগবাদ বাংলাদেশকে গ্রাস করে এক সামাজিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইনফ্লুএঞ্জার মত এটাও এক সজ্ক্রামক ব্যাধি। মানুষ নিজেও বুঝতে পারেনা কখন সে এই রোগে সজ্ক্রমিত হচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবের সময় এই রোগ প্রকট আকার ধারণ করে। এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের সমাজ এক নির্লজ্জ ভোক্তাসর্বশ্ব সমাজে পরিণত হয়েছে। গুণগত দিক দিয়ে এই ভোক্তাবাদ মার্কিন ভোক্তাবাদের মতই। এই দু দেশেই এক স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ না থাকায় বা থাকলেও তার প্রতি এক নিদারুণ অবজ্ঞা বা অবহেলার কারনে, ও তার সমৃদ্ধ অতীতের সঙ্গে কোন যোগসূত্র অনুভব না করায় যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয় তার ফলে মানুষ ভোগের বা ভোগের প্রতিযোগিতার মধ্যেই জীবনের অর্থ বা পূর্ণতা খুঁজতে চেষ্টা করে। একের অর এক বস্তু সামগ্রী আহরণের এক অদম্য বাসণা তাকে গ্রাস করতে থাকে। ইউরোপীয় সমাজগুলী তাদের অতীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে এক জোরাল ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারায় এই রোগে অপেক্ষাকৃতভাবে কম আক্রান্ত হয়েছে। ভারত আমাদের মত এতটা লাগামহীনভাবে ভোগবাদী হয়ে ওঠেনি, শহরাঞ্চলগুলি বাদে। বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভাবে অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে নিত্য নূতন জিনিষ সংগ্রহ করার এক প্রতিযোগিতার নেশা যেন পেয়ে বসেছে সবাইকে। নিজেকে অন্যের কাছে যাহির করা, অন্যের চেয়ে বেশী সামগ্রীর অধিকারী হবার ধান্ধাই সবাইকে চালিত করছে। অনেকে হঠাৎ করে কালো টাকার মাধ্যমে বা দুর্নীতির দ্বারা প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে উন্মত্তের মত কেবল খরচ করার নেশায় মেতে উঠছে। আবার কেউবা এর মাধ্যমে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এক কৃত্রিম অনুভূতির সৃষ্টি করেন। তবে এই কেনার তাগিদ বিত্তশালী বা কম বিত্তশালী সবাই অনুভব করেন। কম বিত্তশালীরা এর দরুন ক্রমাণ্বয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ভোগবাদ বা ভোক্তাবাদ (Consumerism) শব্দটির বেশ চলন থাকলেও এখানে ভোক্তাবাদকে একটু বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করি। এতে আমার ব্যক্তিগত কিছু ধারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়লেও আমার এই লেখার বক্তব্যের সাথে এই ব্যখ্যাই সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। নিজের অন্তরের তাড়নাই কোন ক্রয় বা বস্তু সংগ্রহের আদি কারণ হলে সেটা কে ভোগবাদ বলা হবে না। এই বস্তু সংগ্রহের পেছনে সামাজিক কোন প্রভাব নেই। এটা কাউকে প্রভাবিত বা চমৎকৃত করার জন্য নয় বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নয়। এটার আসন্ন(Proximate) ও চূড়ান্ত(Ultimate) কারণ ভেতরের তাগিদই একশ ভাগ। কেউ একটি কবিতার বই বা গানের টেপ শুধু নিজে পড়ে বা শুনে আনন্দ পাওয়ার জন্য কিনতে পারেন আবার ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখার জন্য কিনতে পারেন। প্রথমটি ক্রয়টি ভোক্তাবাদী শ্রেণীতে পড়েনা, দ্বিতীয়টি পড়ে। নিজের পছন্দের গান বা বাজনা যাতে ভালভাবে শুনতে পাই তার জন্য উন্নত মানের প্লেয়ার কেনা ভোক্তাবাদ নয়। কিন্তু দামী গাড়ী, হাই ফ্যাশনের দামী জামা, ঘর সাজানোর সরঞ্জামাদি, বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি কেনা ভোক্তাবাদী কেনার কাতারে পড়ে। ভোক্তাবাদী কেনাকাটা নিজের মধ্যে সীমিত থাকে না। এটা সজ্ক্রামক ব্যাধির মত অন্যকে প্রভাবিত করে ও ছড়াতে থাকে। এই

কেনাকাটা সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে, যা মানুষ্কে কিনতে ও কিনাতে উদবুদ্ধ করে। এটা একটা অপসংস্কৃতি বৈ কিছু নয়। ভোক্তাবাদ বিরোধী চিন্তার সমালোচকরা ভোক্তাবাদের সপক্ষে কিছু যুক্তি খাড়া করেন যা আমি এই লেখার শেষদিকে আলোচনা ও খন্ডন করার চেষ্টা করব।

মিতব্যয়িতা, মিতাচার, লোভের নিবৃত্তি এ সবই ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানব সমাজের এক সার্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃত। বাইবেলের নীতিবাক্য সমূহের (Proverbs) অধ্যায়ে লেখা আছে "দারিদ্র্য নয়, ঐশ্বর্য্য ও নয়, আমাকে শুধু বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তাই দিও প্রভু"। সরল জীবনএর আদর্শ একটি অতি প্রাচীন মূল্যবোধ। ডেভিড শি (David Shi) তাঁর "সহজ জীবন(The Simple Life)" বইতে এই সত্যটি জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। প্রাচীন গ্রীকরাও বিলাসিতা ও দারিদ্র্যের মাঝামাঝি একটা মধ্যম পথের কথা বলতেন। বিশেষ করে আরিস্টটল প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুসামগ্রী আহরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। এটা নিয়ে দার্শনিক জেরোম সেগাল তাঁর "সুন্দর সারল্য(Graceful Simplicity)" বইটিতে আলোচনা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক জীনোর অনুসারী যাঁরা নির্বিকারবাদী (Stoic) ও অপসূয়ক (Cynic) বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা বিশেষ করে বস্তুবাদের প্রতি বিমুখ ছিলেন। রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছিলেন "জীর্ণ ছাদ এক সময় মুক্ত মানুষের মাথার উপর অবস্থান করত। এখন মারবেল আর সোণার দালানের নীচে বাস করে শৃঙ্খলিত মানুষ "। কুরানেও বারবার বেশী ধন সম্পত্তির পেছনে ধাবিত না হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রেও মিতাচার ও মিতব্যয়িতার উপর জোর দেয়া হয়েছে, যেমনটি দেয়া হয়েছে বৌদ্ধ ধম্মপদে।

বৃটিশ ঐতিহাসিক স্যর আর্নল্ড টয়নবী ২২ টি বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান ও পতন পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে একটি সভ্যতার উৎকর্ষের মাপকাঠি হল সেই সভ্যতা তাদের শক্তি কতটা বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে সরিয়ে আধ্যাত্মিকতা, নন্দনতত্ত্ব ও শিল্প সঙ্কস্কৃতির দিকে নিবদ্ধ করতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঊনবিংশ শতকেই শিল্প বিপ্লবের দরুণ সৃষ্ট নব্য ভোক্তাবাদিতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমারসন ও হেনরী ডেভিড থারোর নেতৃত্বে অতীন্দ্রিয়বাদী আন্দোলন (Transcendentalist Movement), বিশুদ্ধবাদী ((Puritans) ও কুয়েকারদের(Quakers) আন্দোলন , যারা সবাই জীবনে সারল্য ও মিতব্যয়িতাকে এক মহান আদর্শ হিসেবে প্রচার করে গেছেন।

কিছু মনীষী বা খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের উক্তি নীচে উদ্ধৃত করছিঃ

ভিক্টরিও যুগের বিখ্যাত কবি,লেখক ও শিল্পী জন রাস্কিন এর এক উক্তিঃ "কোন অধিকারে তুমি সম্পদ শব্দটিকে, যা কিনা আদিতে ভাল থাকাকে বোঝাত, আজ তাকে নীচে নামিয়ে সঙ্কীর্ণ অর্থে সীমিত করে বিশেষ কিছু বস্তুসামগ্রী যা অর্থ দিয়ে মাপা যায় তাকে বোঝাতে চাইছ?"

কনফুসিয়াস(খৃঃপূ ৫৫১- ৪৭৯) বলেছিলেন "উন্নত লোকেরা কোনটা ভাল সেটা বোঝে, নীচু লোকেরা বোঝে কোনটা ভাল বিক্রী হবে। উন্নত লোক তার অন্তরাত্মাকে ভালবাসে, নীচু লোক তার সম্পদকে।"

লেনার্ডো ডা ভিঞ্চি (১৪৫২- ১৫১৯)ঃ "ছোট ঘর বা কক্ষ চিত্তকে ঠিক পথে নিয়ে যায়, বিশাল কক্ষ বিপথে নিয়ে যায়"

খ্যাতনাম মার্কিন ঐতিহাসিক ও লেখক থিওডোর রসাক(Theodore Roszak,১৯৭২) : "বিশ্ব দারিদ্র্যের কোন আলোচনায় যদি আমাদের অপচয় ও ভোগের অভ্যাস, আমাদের রুচি ও আমাদের উড়নচন্ডে জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনার দাবী করা না হয় তবে সে আলোচনা হবে হঠকারিতাপূর্ণ"

মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন আডামস তাঁর স্ত্রীকে বলতেন "প্রিয়া, মিতব্যয়িতাই আমাদের জীবনের পাথেও হওয়া উচিৎ"। মার্কিন প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট ও ২০ এর দশকের সময়, যা মার্কিন ইতিহাসে হৈচৈময় ২০শতক (Roaring Twenties) হিসেবে খ্যাত, লাগামহীন ভোক্তাবাদ এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতেন। পঞ্চাশ দশকে আমেরিকার আর্থিক প্রবৃদ্ধির বিস্ফোরণের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমান টিভিতে মার্কিন জনগণকে যা তাদের প্রয়োজন শুধু তাই যেন তার কেনে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেইথ তাঁর নামকরা বই "বিত্তশালী সমাজ(The Affluent Society)" তে একজায়গায় লিখেছেন "প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতি তার নিজের সৃষ্ট প্রয়োজনকেই মিটায়, সুখের প্রকৃত কোন প্রবৃদ্ধি হয় না।" অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি আর প্রয়োজন চক্রাকার সম্পর্কে লিপ্ত। একে অপরের ইন্ধন যোগায়। প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক এডোয়ার্ড এবীর(Edward Abbey) একটি উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঃ "প্রবৃদ্ধির খাতিরেই প্রবৃদ্ধি হল ক্যান্সারের কোষের আদর্শ" ।

১৯৬৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট কেনেডি (প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাই) এক নির্বাচনী ভাষণে বলেন যে "কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেই আমরা কোন লক্ষ্য বা ব্যক্তিগত তৃপ্তি পেতে পারিনা...জাতীয় উতপাদনের কারণে রেড্উড বন ধ্বংস হচ্ছে, মরে যাচ্ছে সুপিরিয়র হ্রদ।"

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ১৯৭৯ সালে তাঁর বিখ্যাত "জাতীয় ব্যাধি(National Malaise)" ভাষণে তথাকথিত আমেরিকান স্বপ্ন (American Dream) এর ধারণা কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে "আমাদের অধিকাংশই এখন আত্মতোষণ ও ভোগের পূজারী হয়ে যাচ্ছি।" দুর্ভাগ্যবশত এর কিছু পরে তিনি বিদায় নিলে রোনাল্ড রেগান প্রেসিডেন্ট হয়ে আসেন আর আমেরিকার অর্থনীতিকে ভোক্তাবাদী করার ষোলকলা কাজ পূর্ণ করেন। আর এর সাথে সাথে মুক্ত বাজারের নামে বিশ্বকেও ক্রমাগত ভোক্তাবাদের দিকে ঠেলে দিতে লাগল মার্কিন ভোক্তাবাদ যা আজ আমরা বাংলাদেশেও দেখতে পাচ্ছি। আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথও বস্তুবাদ বা ভোক্তাবাদের বিরূদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

উপরের বাণীসমূহ বর্তমান বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রে কতই না প্রজোয্য। প্রতিবছর রমজান মাস আত্মনিয়ন্ত্রন ও মিতাচারের বাণী বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা কি দেখি? কেনাকাটার ধূম। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিলাস দ্রব্য কেনার জন্য ক্রেতাদের ছুটাছুটি, ইফতার পার্টিতে বিত্তবানদের ভুরিভোজের আয়োজন । আসর আলোচনার মুখ্য বিষয়ও হয়ে দাঁড়ায় কেনাকাটা। একদিকে সারাদিন না খেয়ে ও ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা দেখে ইফতার করে রোজা ভাঙ্গা ও অন্যদিকে সারাদিন বা সন্ধ্যায় কেনাকাটার ঘোড় দৌড়ে লিপ্ত হওয়া, অসামঞ্জস্যপূর্ণই বটে। বরং যেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হত সেটা হল বছরের বাকী এগার মাসেও যে কেনাকাটার ধূম (অপেক্ষাকৃত কম) পড়ে তাতে এই মাসে একটা বিরতি টানা। ১৯৯২ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে কল লাস্ন (Kalle Lasn) নামে এক প্রাক্তন বিজ্ঞাপন কর্তা (যিনি এখন AdBuster ম্যাগাযিনের সম্পাদক) "কিছু না কেনার দিন(Buy Nothing Day বা BND)" নামে যে দিবসের প্রবর্তন করেন আজ তা বিশ্বের কম পক্ষে ৬৫ টি দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেসরকারীভাবে উদ্‌যাপন করে। এখন এটা আন্তর্জাতিক কিছু না কিনার দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এটা পালিত হয় Thanksgiving Day এর অব্যবহিত পরের শনিবার এ। যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনটি পালিত হয় Thanksgiving Day এর পরের দিন যা কেনাকাটার সবচেয়ে বড় দিন বলে পরিচিত। এটা একটা প্রতিবাদের দিন। সেইদিন বড় বড় বিপণী কেন্দ্রতে এই দিনের ব্যানার পিঠে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। আবার কেউবা দোকানে শপিং কার্টএ জিনিষ ভর্তি করে দোকানেই রেখে আসেন। টিভির ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপণের বিরুদ্ধে লাস্ন নিজেও টিভি তে প্রতিবিজ্ঞাপন(Uncommercial) দিতেন এই ঘোড়ারোগের বিরুদ্ধে। ভোক্তাবাদবিরোটী এই দিবসের দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে কমপ্যাক্ট (Compact) নামে আর একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ঈদ অবশ্যই খুশী আনন্দের দিন। কিন্তু এইদিন কি এরকম কেনাকাটার মাধ্যমেই অর্থবহ হতে হবে, বিশেষ করে যখন এই কেনাকাটা হচ্ছে যাদের আছে তাদের জন্যই? সমাজের পরিত্যাক্ত, ভাগ্যহীন, পিতৃমাতৃহীন যারা দু বেলা পেট পুরে খেতে পারেনা তাদের জন্যই কি এই কেনাকাটা বেশী মানানসই হয়না। বিশেষ করে রমজান মাসে রোজা রাখার অন্যতম তাৎপর্য হিসেবে অভুক্তদের কষ্টের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করাকে বলা হয়।

ভোক্তাবাদ হল প্রকৃতপক্ষে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি নেশা। মদ্যপানকে আমাদে সমাজে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু কেনাকাটার নেশাকে সেভাবে দেখা হয়না। এই ঘোড় দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কেউই জয়ী হয় না। আশ্চর্যময় দেশে এলিস গল্পের সেই লাল রাণীর কথাই মনে করিয়ে দেয় " সবাইকে দৌড়াতে হয় এই দেশে শুধু একই জায়গায় থাকার জন্যই।"

যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক সমূহ মানুষকে ঋণের দিকে ঠেলে দিয়েই লাভ করে। একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশেও। এখানেও ক্রেডিট কার্ডের প্রলোভনের স্বীকার হচ্ছেন ক্রমবধর্মান এক জনগোষ্ঠী। কেনার জন্যই কেনা, এই মানসিকতা সৃষ্টির পেছনে ক্রেডিট কার্ডের অবদান অনস্বীকার্য। আর এর দরুন দেউলিয়া হয়ার পথ সুগম হচ্ছে। কেনাকাটার এই তীব্র নেশাই বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন দেশে পরিণত হবার প্রধান কারণ। আমাদের দেশে একসময় সততা, মিতাচারিতা ও নীতিকে মূল্যবান সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে মনের ভেতরে গেঁথে দেয়া হত পারিবারিক ও স্কুল পর্যায়ে। বস্তুবাদী মোহের কুফল সম্পর্কে একটা প্রবৃত্তিগত বোধ সৃষ্টি করা হত মনের গভীরে । কিন্তু বর্তমান সংস্কৃতিতে যে যত বেশী ভোগ্যপণ্যের মালিক সেই তত বেশী বড়, এই আদর্শ কেই উন্নত করা হচ্ছে। সততা, মিতাচারিতা ও নীতিকে সেকেলে বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। ভোক্তাবাদের এক অশুভ দিক হল শুধু যে নিজেই কেনার বাতিকে লিপ্ত হওয়া তাই নয় ,অন্যকেও কিনতে উদ্বুদ্ধ করাও। এক প্রচন্ড অদৃশ্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয় যা চক্রাকারে এই ভোক্তাবাদকে এক শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত করে। অনেকে দুর্নীতির কারণ হিসেবে দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যখন বাংলাদেশ সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন দেশ ছিলনা তখন তো আরও কম ছিল। অনাহারেও আরও বেশী লোক ভুগত। কাজেই এই যুক্তি ধোপে টেকে না। আবার কেউ বা দুর্নীতির জন্য এক বিশেষ জনগোষ্ঠী (আমলা, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী, বিত্তশালী, ইত্যাদি) কে দায়ী করেন। যেন ঐ জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্য কোন জীনের দ্বারা গঠিত। প্রকৃত সত্য হল কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী নয়, বরং সামাজিক মূল্যবোধের (বা মূল্যবোধের শিক্ষা) এর অভাবই এর প্রকৃত কারণ। ভোক্তাবাদকে পূজা করা যখন এক সামাজিক মূল্যবোধ এ পরিণত হয়, আর ভোক্তাবাদের চালিকা শক্তি অর্থাৎ "ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি",তাকে জিইয়ে রাখতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে সমাজ কি করে তখন সততা, মিতাচারিতা ও নীতিকে গৌরবান্বিত করতে পারে? আগেই বলেছি অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা এই "ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি"র দৌড়ে মানুষকে ঠেলে দেয়। কাজেই মূল্যবোধের শিক্ষার মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক বা ঈর্ষাকাতর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেও একটা চেতনা সৃষ্টি করা উচিত। দুর্নীতিবাজদের

ধরার অভিযান চলছে বাংলাদেশে। বলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ার। কিন্তু শুধু দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার ও দুর্নীতির বিরূদ্ধে কথা বলেই দুর্নীতির মূলোৎপাটন সম্ভব নয়, যদি না এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্মাজিক আন্দোলন পারিবারিক, স্কুল এবং বন্দুবান্ধব পর্যায়ে হয় এবং মিতাচার, নিতব্যয়িতা আর আয় বুঝে ব্যয় করার দর্শনকে জোর দিয়ে মনের ভেতরে প্রবেশ করান হয়। এমন এক সময় ছিল যখন গৃহিণীরা স্বামীর সততাকে মুল্য করতেন ও আয় বুঝে ব্যয় এর সোণালী রীতিকে মেনে চলতেন। এখনকার সাদাসিধে গৃহিণীরাও স্বামীকে নিত্য নতুন জিনিষ ক্রয়ের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন, তা সেটা সৎ ভাবেই হোক বা দুর্নীতির মাধ্যমেই হোক, আয় কিভাবে হল, সৎ না অসৎ ভাবে সেটা তাঁরা তোয়াক্কা করেন না। এতে যোগ দেয় সন্তান সন্ততিও। তাদের চাপেই অনেকে দুর্নীতিতে লিপ্ত হন। এই ভোক্তাবাদ যে শুধু সামাজিক অবক্ষয়ই বয়ে আনছে তাই নয়, পরিবেশ দূষণেরও এক মূখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত বেশী কেনা হয় তত বেশী উৎপাদন হয়, আর তত বেশী পরিবেশ দূষিত হয়। সকল শিল্পজাত বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের সময় ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ অনিবার্য্যভাবে সৃষ্টি হচ্ছে যা পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য (Ecological Balance) বিনষ্ট করছে।

ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রাচীন দার্শনিকদের ও ধর্মগ্রন্থের লেখার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া কার্ল মার্ক্সও ভোক্তাবাদের আবির্ভাব ও মানুষের অতিভোগের প্রবৃত্তিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। মার্ক্সবাদী না হয়েও মার্ক্সের শঙ্কার সঙ্গে অনেকে একমত হবেন। মার্ক্সের চিন্তায় যেটা ছিল সেটা হল শিল্প বিপ্লবের সময় প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদনের সময় সঙ্কুচানের দরূন যে বাড়তি মুক্ত সময় সৃষ্টি হয় সেটা মানসিক উৎকর্ষ ও সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এটাই কাম্য ছিল। তিনি লিখেছিলেন "বাড়তি খরচযোগ্য সময় (Disposable Time) একটি সম্পদ, আর সেই সম্পদ হচ্ছে স্বাধীনতা - - - আনন্দ খোঁজার স্বাধীনতা, জীবনকে উপভোগ করার স্বাধীনতা, চিত্তের উৎকর্ষ সাধনের স্বাধীনতা" (Das Capital এর তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৯৫৪)। কিন্তু আসলে যা ঘটল তা হল লোভী শিল্পপতিরা উৎপাদনের সময় কমে যাওয়া সত্ত্বেও কল কারখানা চালু রাখার সময় না কমিয়ে (পূর্বের উৎপাদন পরিমাণ এক রেখে) বরং উৎপাদন বাড়াবার লক্ষ্যে কল কারখানাগুলির সময় আরও বাড়িয়ে দেন। অধিক উৎপাদনের জন্য ক্রেতা পাওয়ার জন্য এক কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করাও দরকার হয়ে পড়ল। এর থেকেই ভোক্তাবাদএর উদ্ভব হল। যে বাড়তি সময়টা পরিবার পরিজন ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য ব্যয়িত হবার কথা সেটা ব্যয়িত হল বাড়তি উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের পরিশ্রমে, যার সুফল ভোগ করলেন মূলত কারখানার মালিকেরাই। নতুন জিনিষ কেনার জন্য মানুষের মনে কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করার বণিকশ্রেণীর সেই পুরান কৌশল এখন মানুষের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। আর এই কেনার প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ আরও পরিশ্রম করে আরও উপার্জন করার নেশায় মেতে উঠছে। নিজের প্রিয়জন ও নিকটদের জন মূল্যবান সময় দেয়া বা মনের বিকাশের জন্য সময় ব্যয় করাকে এখন পুণ্যকাজ হিসেবে স্বীকৃত হয় না। বরং বেশী কাজ করে বেশি আয় করা, যাতে আরও ক্রয় করা যায় সেটাকেই পুণ্য বলে গণ্য করা হয়। পিতামাতার অধিক উপার্জনে এতটা ব্যাস্ত যে তাঁদের সন্তানের জন্য ভাল সময় কাটানোর কথা আর ভাবেন না। তাদের বাচ্চারা ভিডিও গেম্‌স নিন্টেন্ডো ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। অথচ ভাল সন্তান গড়ার জন্য পিতামাতাদের নিকট সান্নিধ্যে বাচ্চাদের নানারকম প্রেরণাদায়ক গল্প শোনা, আনন্দময় শিক্ষামূলক খেলায় লিপ্ত হয়া ইত্যাদি খুব গুরুত্ব পূর্ণ। এই ভোক্তাবাদী তাড়নার কাজের নেশা হল আসলে শ্রমের অমর্যাদা, মর্যাদা নয়। আধুনিক বণিকশ্রেণীরা এক নুতন কৌশল অবলম্বন করেন এই কেনার বাতিককে জিইয়ে রাখতে। প্রত্যেক ভোগ্যপণ্যকেই তারা এক বিশেষ সময়ের পর বাতিল করে সামান্য পরিবর্তন করে একই পণ্য নুতনভাবে প্রবর্তন করে "আধুনিক" বলে ক্রেতাকে কিনতে উদবুদ্ধ করেন। ভেড়ার পালের মত ক্রেতা/ভোক্তারা এই ফাঁদে পা দেন। পণ্যকে বিশেষ সময়ের পর অবলুপ্ত/সেকেলে করার কৌশলকে পরিকল্পিত অবলুপ্তীকরণ (Planned

Obsoloscence) বলা হয়। গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমেও এই কৌশলের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে বিবিধ বিজ্ঞাপনের দ্বারা।

পরিহাসের ব্যাপার এই যে বামপন্থী আদর্শবাদীদেরও অনেকে মার্ক্সের এই অত্যধিক উৎপাদন ও ভোগের দরুন আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের শঙ্কাকে বা উৎকন্ঠাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেত পারেন নি। তারা সামাজিক ন্যয়বিচার বলতে বোঝান বিত্তবানরা যে সকল বিলাস দ্রব্য ও সুবিধা ভোগ করেন শ্রমিক শ্রেণীরও যেন ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই একই বিলাস দ্রব্য ও সুবিধা ভোগের অধিকার পান। এটাই তাদের সাম্যের ধারণা। কিন্তু এতে কি লাগামহীন ভোক্তাবাদ কমে? বরং উল্টোটাই হবে। এতে ভোক্তাবাদী ঘোড় দৌড়ে শ্রমিক শ্রেণীকেও অন্তর্ভুক্তীকরণকেই পরক্ষোভাবে সমর্থন করা হচ্ছে। সামর্থ্য হলে তারাও তো সে একই ঘোরদৌড়ের চক্রে জড়িয়ে যাবে। যেমনটি মার্ক্স লিখেছিলেনঃ

> *“শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ান আর দাসদের বেশি পুরস্কার দেয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তা কখনই শ্রমিক বা শ্রমের মানবিক মূল্য বা তাৎপর্য্যকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা”* ।
> (Eric Fromm এর “Marx’s Concept of Man” এর ১০৭ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত)

ভোক্তাবাদকে মোকাবিলা করতে হলে ভোগের প্রবৃত্তি, কেনার জন্য কেনা বা অন্যের কারণে কেনার প্রবৃত্তিকে জয় করতে হবে, ঘোড় দৌড় থেকে নিবৃত্ত হতে হবে, তা বিত্তবান বা বিত্তহীন, মালিক বা শ্রমিক যেই হন না কেন। আর এই ভোক্তাবাদ কম্‌লে বিত্তশালী আর বিত্তহীনদের পার্থক্যটা অনেকটা কমে যাবে, মনস্তাত্বিকভাবে হলেও। কারণ জিনিষ ক্রয়ের মাধ্যমেই বিত্তবানরা তাদের বিত্তকে যাহির করে আর জিনিষের অভাবেই বিত্তহীনরা নিজেকে দরিদ্র ও বঞ্চিত বোধ করে।

ভোক্তাবাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা হল। এখন আসি ভোক্তাবাদের পক্ষে যারা যুক্তি দেন তাঁদের যুক্তির কিছু দুর্বলতা তুলে ধরতে। একটা সমালোচনা হল, বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের দরুন অনেকের কর্ম সংস্থান হচ্ছে। কাজেই ভোক্তাবাদ খারাপ হবে কেন? একটু খতিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা। আমরা দালাল বা ফড়িয়াদের হেয় করি এবং মধ্যমানুষ (Middleman) প্রথার বিলুপ্তির কথা বলি। সেই যুক্তিতে দালাল বা ফড়িয়া ব্যবস্থাও তো চালু রাখা উচিত কর্মসংস্থানের দোহাই দিয়ে। পতিতালয়, সুরি ব জুয়াখানা এগুলও তো কর্মসংস্থান যোগায়। বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের দরুন যে কজন লোকের কর্মসংস্থান হয় তা তাদের ভিক্ষা দেয়ারই সামিল। এতে দেশের কোন উৎপাদনশীল কর্মের সৃষ্টি হয় না। কোন স্থায়ী আর্থনীতিক অবকাঠামো গড়ে উঠেনা। আর আমাদের দেশে বিলাস দ্রব্য হল আমদানীভিত্তিক। এর ক্রয়ের দরুন দেশীয় অর্থনীতির কোন উন্নতি হতে পারেনা। আর ভোক্তাবাদের যে সামাজিক দিকের কথা উল্লেখ করেছি তাতে আমদানীকৃত দামী জিনিষই ভোক্তাবাদী কেনাকাটার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। দেশীয় সাদামাটা কম দামী জিনিষ কিনে তো অন্যের কাছে নিজেকে যাহির করা বা সামাজিক প্রভাব বিস্তার করা যায়না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হোল লাভ ক্ষতির অঙ্ক। সামান্য কিছু ছুটকা কাজের জন্য ভোক্তাবাদী ঘোড়া রোগ যে সামাজিক সর্বনাশ ও দুর্নীতি ডেকে আনে সেটাই কি লাভ ক্ষতির অঙ্কে বেশী বাঞ্ছণীয় বা লাভজনক? দেশের সামগ্রিক আর্থনীতিক উন্নতি অবকাঠামো উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী শিল্প স্থাপনের দ্বারা করাই অধিকতর বাঞ্ছণীয়। বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের দ্বারা সামাজিম বা আর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব এটা কোন সমাজনীতি বা অর্থনীতির তত্ত্বে বলে কি?

যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্রমবর্ধমান ভোগবাদজনিত ক্রয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সেখানে ভোক্তা ঋণ পরামর্শ সেবা(Consumer Credit Counselling Services) সৃষ্টি হয়েছে এফ্লুএঞ্জা আক্রান্তদের সহায়তার জন্য। সেখানে স্বেচ্ছামূলক সরলতা (Voluntary Simplicity) নামে একটি

ভাবধারা, যা ঐ নামে ডুয়ান এলজিনের লেখা একটি বই এর অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট তারই ভিত্তিতে সিসিল এন্ড্রুস এর নেতৃত্বে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে যার নাম "সরলতার বীজ"। এই সংগঠন টি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনারের আয়োজন করে জনগণের মধ্যে সরল জীবন যাপনের গুণাবলী বুঝানোর চেষ্টা করে। তাদের লক্ষ্য হল মিতাচার অ মিতব্যয়িতার পুরান মূল্যবোধকে পুনর্জাগরীত করা, যখন ভোক্তা কথাটি একটা ঘৃণ্য শব্দ হিসেবে বিবেচিত হত। অতীতের অতীন্দ্রিয়বাদীরা আবার নতুন করে আবির্ভূত হচ্ছেন। কট্টর ভোক্তাবাদী মার্কিন সমাজেও অনেক প্রেরণাদায়ক সত্য কাহিনী আছে যা বাংলাদেশের জন্যও প্রেরণার উৎস হতে পারে। যেমনঃ

১। ডিক ও জিনী রয়দের গল্পঃ ডিক রয় ছিলেন এক কর্পোরেট এটর্নী, তাঁর অফিস ছিল ৩২ তালায়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ পরিবেশবাদী ও মিতব্যয়িতায় পুরো বিশ্বাসী। তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁর চাকরি ছাড়তে অণুপ্রাণিত করেন ও দুজনে মিলে তাদের জীবন নিয়োজিত করেন পরিবেশ সংরক্ষণ ও সরল জীবন যাপনের লক্ষ্যে। তাঁরা উত্তরপশ্চিম ধরিত্রী ইন্সটিটিউট (NorthWest Earth Institute) স্থাপন করেন যা পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ওয়ার্কশপ ও সেমিনারএর আয়োজন করে।

২। জো ডমিনিগেস ছিলেন ওয়াল স্ট্রীটের এক স্টক ব্রোকার আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন অভিনেত্রী। তাঁরা দুজনেই তাঁদের নিজ পেশা ছেড়ে দিয়ে সরল জীবন যাপনের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং "For Money or Your Life" নামক বেস্ট সেলার বই লেখেন।

৩। দায়িত্বশীল বিত্তবানদের ক্লাব (Responsible Wealth Club): এই সংগঠনটি লাখপতিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা তাঁদের সব আয়ই তাঁরা দুস্থ ও কম ভাগ্যবানদের জন্য নিয়োগ করার অঙ্গীকার করেছেন। তাঁরা ধনীদের ট্যাক্স ছাড় দেয়ার বিরোধী। এদের মধ্য নাম করা হচ্ছেন গায়িকা শের (Cher) অ অভিনেত্রী কৃস্টিনা লাটি(Christina Lahti).

বাংলাদেশেও কি এই সামাজিক আন্দোলনের সময় আসেনি? রাজনৈতিক নেতারা কি নির্বাচনী ভাষনে কেনেডি বা কার্টারের মত ভোক্তাবাদের বিরুদ্ধে সাহসী বক্তব্য রাখতে পারবেন না? অবশ্য তাঁর জন্য তাঁদের নিজেরদেরকেও প্রথমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেত হবে। এফ্লুএঞ্জার টিভি সিরিয়ালটি পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচারিত হয়েছিল। এটা অনেক দেশে যেমন শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইস্রাইল, এমনকি বর্মা (মায়ানমার) এও সচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যেখানে উত্তরআঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের কর্মীরা এই সিরিয়ালটি তাদের স্থানীয় ভাষা কাচিনে আওনুবাদ করে এর প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলি পাশ্চাত্যের অনেক সিরিয়ালই ত দেখান হয় ও ভোগবাদের পক্ষে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাঁরা কি একবার ও এই সিরিয়ালটি দেখাতে পারেন না?

কিছু বইএর নির্দেশনাঃ

১। Affluenza : The All Consuming Epidemic – John De Graaf & others

২। Less Is More: An Anthology of Ancient & Modern Voices Raised in Praise of Simplicity - Goldian VandenBroeck

৩। Voluntary Simplicity - Duane Elgin